গত দশকে নজরদারিতে বাংলাদেশের ব্যয় ১৯০ মিলিয়ন ডলার:টেকগ্লোবাল ইন্সটিটিউট এর প্রতিবেদন



সংগৃহীত ছবি

টেকগ্লোবাল ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসেছে উদ্বেগজনক চিত্র— ২০১৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ প্রায় ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে ১৬০টিরও বেশি উন্নত নজরদারি প্রযুক্তি ও স্পাইওয়্যার আমদানি ও ব্যবহার করেছে। কিন্তু সন্ত্রাস দমনের আড়ালে এসব প্রযুক্তি রাজনৈতিক বিরোধী, সাংবাদিক, অধিকারকর্মী এবং সাধারণ নাগরিকদের ওপর ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হয়েছে, বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচন ও আন্দোলনের সময়ে।

৭০ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব প্রযুক্তি প্রায়শই অস্বচ্ছ ক্রয়প্রক্রিয়া ও তৃতীয় দেশের মধ্যস্থতায় দেশে এসেছে। এক বছরের গবেষণার ভিত্তিতে তৈরি এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়— ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ হামলা এবং ২০১৬ সালে ঢাকার হলি আর্টিজান হামলার পর সন্ত্রাসবিরোধী উদ্যোগের নামে নজরদারির বিস্তার দ্রুত ত্বরান্বিত হয়।

গত এক দশকে দেশের নজরদারি ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক যুগের পুলিশি ধারা থেকে আধুনিক সাইবারভিত্তিক নেটওয়ার্কে রূপ নিয়েছে। ব্যবহৃত সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে আইএমএসআই ক্যাচার, ওয়াই-ফাই ইন্টারসেপ্টর, সেলিব্রাইট, ফিনফিশার, প্রিডেটরসহ এমন প্রযুক্তি, যা বিস্তৃত ও প্রায়শই পরোয়ানাবিহীন নজরদারি পরিচালনার সুযোগ দেয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোট ব্যয়ের অন্তত ৪০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে ইসরায়েলি উৎসের প্রযুক্তিতে— যা বিশ্বের বহু স্বৈরশাসিত রাষ্ট্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে। র‍্যাব ও পুলিশ ওয়াই-ফাই ও মোবাইল নেটওয়ার্ক ইন্টারসেপশন, সিগন্যাল জ্যামিং এবং বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সরঞ্জামে বিনিয়োগ করেছে। অন্যদিকে, ডিজিএফআই সেল নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ, কল ট্যাপিং ও সিগন্যাল জ্যামিংয়ের জন্য অবকাঠামো গড়ে তুলেছে এবং ২০১৫ সালে সিটিজেন ল্যাব থেকে ফিনফিশার স্পাইওয়্যার সংগ্রহ করে, যা ডিভাইসে ম্যালওয়্যার ইনস্টল করে তথ্য চুরি করতে সক্ষম।

ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও যুক্তরাজ্যের কোম্পানির পাশাপাশি ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠান সেলিব্রাইট, এনএসও গ্রুপ (পেগাসাস), ইনটেলেক্সা, কোরালকো টেক এবং ইউটিএক্স টেকনোলজিসের সরঞ্জাম সাইপ্রাস, সিঙ্গাপুর ও হাঙ্গেরির মতো তৃতীয় দেশের মাধ্যমে এসেছে। তুরস্কের বিলগি টেকনোলজি টাসারিম (BTT) থেকেও নজরদারি সরঞ্জাম কেনা হয়েছে।

আইনগত দুর্বলতাকেও প্রতিবেদনে দায়ী করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১, টেলিগ্রাফ আইন ১৮৮৫ এবং ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি আইন ১৯৩৩— এই পুরনো আইনগুলো এমনভাবে প্রয়োগ হয় যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যাপক নজরদারির ক্ষমতা পায়। এ প্রক্রিয়ায় সংসদীয় তদারকি, বিচারিক অনুমোদন কিংবা কার্যকর জবাবদিহিতার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলস্বরূপ, নজরদারি ব্যবস্থা জননিরাপত্তার বদলে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হয়ে উঠছে।

রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে নজরদারি প্রযুক্তি কেনাকাটা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। এমনকি সর্বশেষ ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতেও র‍্যাবকে জনসমাবেশ ও বিক্ষোভে ব্যবহারের জন্য নতুন মোবাইল ইন্টারসেপশন ডিভাইস কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

টেকনোগ্লোবাল ইনস্টিটিউট সতর্ক করেছে— আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ছাড়া বাংলাদেশে "ডিজিটাল স্বৈরশাসনের মডেল" আরও শক্তিশালী হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যেখানে নজরদারি জনগণের সুরক্ষার বদলে রাজনৈতিক ক্ষমতার অস্ত্র হয়ে উঠবে।